উত্তপ্ত

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

কাঠগড়ায় উপাচার্য

লিখেছেন **রবিউল আলম** *খুলনা থেকে*

রাজনীতি নেই, সন্ত্রাস নেই, সেশনজটও মুক্ত। পরীক্ষার পরপরই রেজাল্ট। কোর্স, পাঠদান পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন সবই আন্তর্জাতিক মানের। দীর্ঘ ১৪ বছরের ইতিহাসে খ্যাতির শীর্ষে অবস্থানকারী খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সুনাম এখন হারাতে বসেছে। শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতায় সৃষ্ট অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় টানা এক মাস বন্ধ থাকার পর ৪ আগস্ট ক্লাস শুরু হলেও এ ঘটনার জের ধরে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে উত্তপ্ত অবস্থা বিরাজ করছে। অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা করছেন সাধারণ শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা। ক্যাম্পাসে রাজনীতি চর্চা নিষিদ্ধ থাকলেও শিক্ষক-কর্মকর্তাদের মধ্যে বিদ্যমান দীর্ঘদিনের নষ্ট রাজনীতি কার্যত এখন প্রকাশ্যে চলে এসেছে। ফলশ্রুতিতে ক্যাম্পাসে ঘটছে অসুস্থ সব ঘটনা। সর্বশেষ গত ৪ জুলাই ছাত্রদের দ্বারা উপাচার্য লাঞ্ছিত হন।

এ অবস্থায় শিক্ষক সংকট মোকাবেলায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নতুন শিক্ষক নিয়োগের উদ্দেশ্যে গত বছর মে মাসে পত্রিকায় সার্কুলার জারি করে। তিনটি পদের বিপরীতে প্রার্থী হয় ২৮ জন। পাঁচ সদস্যের নিয়োগ বোর্ড কর্তৃক চূড়ান্ত প্রক্রিয়া শেষে ৭ জন প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষায় ডাকা হয়। ১৯ মে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ৭ প্রার্থীর মধ্যে ইসহাক সাইদীকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু শিক্ষক নিয়োগ করার কথা ৩ জন। নিয়োগ বোর্ডের সদস্য ও অর্থনীতি ডিসিপ্লিন প্রধান ড. সাইফুল ইসলাম সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, উপাচার্য ও নিয়োগ বোর্ডের সভাপতি ড. এম আব্দুল কাদের ভুঁইয়া হঠাৎ করে আমাদের বলেন, আজ একজনের বেশি নিয়োগ দেয়া যাবে না এবং তার মনোনীত প্রার্থী ইসহাক সাইদীকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। আমরা উপাচার্যের ঐ সিদ্ধান্তের জোর প্রতিবাদ করি। বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে এ নিয়ে উত্তপ্ত বাকবিতন্ডা হয়।

জানা গেছে, ইসহাক সাইদী অপেক্ষা অনেক ভালো একাডেমিক কেরিয়ারসম্পন্ন প্রার্থী ছিল। জাবি থেকে আয়শা সিদ্দিকা, ইবি থেকে রফিকুল ইসলাম প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং চবি থেকে তসলিম উদ্দিন প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থানে উত্তীর্ণ। তা সত্ত্বেও তাদের বাদ দেয়া হয়। মূলত উপাচার্যকে লাঞ্ছিতের ঘটনার সূত্রপাত এখান থেকেই শুরু। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন প্রফেসর ২০০০কে জানান, উপাচার্য চান না তার রাজনৈতিক মতাদর্শের বাইরে কেউ নিয়োগ পাক। ঐ দুটি পদে উপাচার্য তার মনোনীত দু'ব্যক্তিকে এডহকভিত্তিতে নিয়োগ দিতে চান।

জানা গেছে, ইতিপূর্বে উপাচার্য পাস কোর্সে স্নাতক পাস করা সেলিনা আহম্মেদ সামজবিজ্ঞান ও সাধারণ মানের ছাত্রী ফারিয়া মাসুমকে অর্থনীতি ডিসিপ্লিনে প্রথমে এডহক নিয়োগ এবং পরে তাদের চাকরি স্থায়ী করে বিতর্কিত হন। বারবার অর্থনীতি ডিসিপ্লিনে অযোগ্য লোকদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়ায় ঐ বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা উপাচার্যের ওপর ক্ষুব্ধ হয়।

রাজনৈতিক নোংরামি : বিপর্যস্ত ভাবমূর্তি

আওয়ামী লীগ ও অন্যদিকে বিএনপি-জামায়াতপন্থি শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ময়দান দখলের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অঘোষিত প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছেন। বর্তমান উপাচার্য ড. এম আব্দুল কাদির ভুঁইয়া নিজেকে বিএনপি মহাসচিব, এলজিআরডি মন্ত্রী আব্দুল মান্নানের জ্ঞাতি ভাই পরিচয় দেন। এ পরিচয়ে তিনি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছেন।

উপাচার্য হিসেবে এখানে আসার আগে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন। রাজনৈতিক বিভিন্ন কর্মকান্ডের কারণে সেখানে তিনি সবার অপ্রিয় ছিলেন। রাবিতে ন্যাপ দিয়ে তার শিক্ষক রাজনীতি শুরু হলেও বিভিন্ন সময় স্বার্থ উদ্ধারে দল পরিবর্তন করতেন। তার শিক্ষকতা জীবনে এককালের সহকর্মী নাম না প্রকাশ করার শর্তে ২০০০কে জানান, ১৯৮০ সালের ৩০ মে আততায়ীদের হামলায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হলে তিনি জিয়া সরকারের শাসনামলকে 'জাতির জন্য অভিশাপের অধ্যায়' ঘোষণা দিয়ে উল্লাস প্রকাশ এবং ক্যাম্পাসে মিষ্টি বিতরণ করেন। 'জিয়ার মৃত্যুর ফলে গোটা জাতি অভিশপ্ত শাসন থেকে মুক্তি পেল'-এ জাতীয় বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়ে রাতারাতি স্বৈরাচার এরশাদের দৃষ্টি কাড়েন। পরে তিনি জাপাপন্থি বনে যান। একইভাবে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নিজেকে আওয়ামী লীগার হিসেবে জাহির করতেন। সর্বশেষ বিএনপির নেতৃত্বে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামীপন্থি খুবির উপাচার্য ড. এস এন নজরুল ইসলামকে লাঞ্ছিত করে তাড়িয়ে দেয়ার পর নতুন উপাচার্য খোঁজা হয়। এ সময় আব্দুল কাদির ভূঁইয়া আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে কুৎসামূলক বক্তব্য দিয়ে বিএনপির আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন।

শিক্ষা জীবনের কোনো সার্টিফিকেট পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর বা বিভাগ না থাকলেও রাজনৈতিক আশীর্বাদ নিয়ে তিনি ২০০১ সালের ১৯ নবেম্বর খুবির উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। প্রশাসনিক সর্বোচ্চ পদে বসেই তিনি দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি শুরু করেন। শিক্ষকতা বা চাকরি করার যোগ্যতা থাক বা না থাক, তার মতাদর্শ অনুসারীদের এখানে ঢোকানো হচ্ছে। পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোনো নিয়মনীতি মানা হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট অনুযায়ী কোনো ব্যক্তিকে পদোন্নতি দিতে হলে অবশ্যই সিন্ডিকেটের অনুমোদন প্রয়োজন। কিন্তু উপাচার্য ২৫ মার্চ তার অনুসারী ৫ শিক্ষক ও ৩০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সিন্ডিকেটের অনুমতি ছাড়াই পদোন্নতি দেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে দুর্বৃত্তায়ন বিগত সরকারের আমলে ঘটেছে। ১৯৯১ সালের ৩১ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান ড. গোলাম রহমান। তার সময় যারা নিয়োগ পান তাদের শতকরা ৯০ জন বিএনপি নেতা-কর্মী বা অনুসারী। ফলে রাজনীতি থাক আর না থাক, প্রথম থেকেই এখানে বিএনপি সমর্থকদের অবস্থান তৈরি হয়। '৯৩ সালে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান বিএনপির আশীর্বাদপুষ্ট বাগেরহাটের বাসিন্দা ড. গোলাম আলী ফকির। তার সময় অনেক ভালো কাজ হলেও দলীয় রাজনীতির স্বার্থে অনেক খারাপ কাজও করেছিলেন। বিএনপিপন্থি লোকজন ঢালাও নিয়োগ পায় এবং অবৈধ পন্থায় সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে। এ সময় এখানে

বিএনপির ভিত গড়ে ওঠে। কিন্তু এর পরও তার বিদায় ক্ষণটি শুভ হয়নি। আওয়ামী লীগ সরকার এলে ১৯৯৭ সালের ৬ আগস্ট মেয়াদ পূর্তির মাত্র ৭ দিন আগে তাকে লাঞ্ছিত করে বিদায় করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে ড. আব্দুল রহমান, ড. মোজাম্মেল হক আজাদ খান, ড. খায়রুল আজমসহ কয়েকজন তাকে অপদস্ত করেন। তবে আব্দুর রহমান ২০০০কে জানান, 'তাকে লাঞ্ছিত করা হয়নি বরং তিনি আগে থেকেই ঢাকায় চলে যান।'

বিএনপির শক্ত ঘাঁটি নড়বড়ে করতে ১৯৯৭ সালের ৩১ মার্চ ট্রেজারার হিসেবে নিয়োগ পান খুলনা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক। ১৯৯৭ সালের ২৩ আগস্ট আওয়ামী লীগের আশীর্বাদ নিয়ে উপাচার্য হয়ে আসেন ড. এস এম নজরুল ইসলাম। কিন্তু তিনি উপাচার্য হলেও ট্রেজারার আব্দুর রাজ্জাক সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতেন। আগে আওয়ামী মনোভাবাপন্ন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী যেখানে ছিল মাত্র ১০ শতাংশ, সেখানে এসে দাঁড়ায় ৫০ শতাংশে। ২০০১ সালের ২১ জুলাই বিএনপিপন্থি শিক্ষকরা উপাচার্য এস এম নজরুল ইসলামকে লাঞ্ছিত করে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া করেন। সর্বশেষ নষ্ট রাজনীতিতে জড়ান বর্তমান উপাচার্য ড. এম আব্দুল কাদের ভূঁইয়া। উপাচার্যরা বারবার লাঞ্ছিত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতির কিছু নমুনা :
কাঠগড়ায় উপাচার্য

শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে যে পরিমাণ দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে তা আগে কখনো ঘটেনি। সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, কম্পিউটার সায়েন্স ও অ্যাগ্রোটেকনোলজি ও ফরেস্ট্রি ডিসিপ্লিনে শিক্ষক নিয়োগে সব থেকে বেশি দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির ঘটনা ঘটেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, পাস কোর্সে স্নাতক পাস করা মিসেস সেলিনা আহম্মেদকে সমাজবিজ্ঞানী ডিসিপ্লিনে এডহকভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে পাস কোর্সে পাস করা কাউকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া এটাই প্রথম। তার ওপর পদোন্নতি বিধিবিধান লঙ্ঘন করে সেলিনা আহম্মেদকে কিছুদিন আগে সমাজবিজ্ঞান ডিসিপ্লিন প্রধানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সেলিনা আহম্মেদের স্বামী ড. কে এম রেজাউল করিমকে এখানে খণ্ডকালীন শিক্ষকের চাকরি দেয়া হয়েছে। অথচ তিনি যশোর এমএম কলেজের শিক্ষক। অর্থনীতি ডিসিপ্লিনের একজন শিক্ষক ২০০০কে জানান, সেলিনা আহম্মেদের সঙ্গে সিন্ডিকেট সদস্য ড. সাইদুল ইসলামের পারিবারিক এবং উপাচার্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এ সূত্র ধরেই তিনি নিয়োগ পান। একইভাবে নগর ও গ্রামীণ ডিসিপ্লিন থেকে পাস করা সাধারণ মানের ছাত্রী ফারিয়া মাসুমকে অর্থনীতি ডিসিপ্লিনে, কেমিস্ট্রির ছাত্র মোঃ শামসুদ্দোহাকে ম্যাথমেটিক্স ডিসিপ্লিনে এবং ডা. কানিজ ফাতেমাকে দুর্নীতি ও অনিয়ম করে প্রথমে এডহক নিয়োগ এবং পরে তাদের চাকরি স্থায়ী করা হয়েছে।

নিয়োগপ্রাপ্ত মোঃ শামসুদ্দোহা নিয়োগ কমিটির বিশেষজ্ঞ ও সিন্ডিকেট সদস্য ড. সাইদুল ইসলামের বড় জামাতা। তার ছোট জামাতা চান মিয়া শেখকে একই প্রক্রিয়ায় গত এপ্রিলে উপাচার্য এডহক নিয়োগ চূড়ান্ত করলে শিক্ষকদের প্রবল আপত্তির মুখে তা বাতিল হয়ে যায়। ফারিয়া মাসুমের ভালো একাডেমিক কেরিয়ার না থাকলেও সরকারি দলের প্রভাবশালী এক নেতার বিশেষ তদবিরের জোরে তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

২০০২ সালে প্রভাষক পদে নিয়োগের জন্য সংবাদপত্রে দেয়া বিজ্ঞাপনে আবেদনপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয় ১৫ জুন। কিন্তু অগ্রণী ব্যাংক বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা থেকে ২৯ জুন ২০০ টাকার ডিডি (নং-১৩৭৮৩৯৫) করে আবেদনপত্র জমা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন জনৈক শমসেদ। বিধি মতে তা বাছাই কমিটি কর্তৃক বাতিল হবার কথা।

আবার মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন না থাকলেও সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে দু'জন ডাক্তার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে একজন হচ্ছেন ডা. রফিকুল ইসলাম। উপ-উপাচার্য ও নিয়োগ কমিটি প্রধান ড. সৈয়দ জাবিদ হোসেন, শ্যালক আব্দুল্লাহ হেল কাফিকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অথচ এ পদে নিয়োগ পাওয়ার জন্য ৫-৬ বছর ধরে মাস্টাররোলে চাকরি করছেন অনেক প্রার্থী। এ ব্যাপার উপ-উপাচার্য সৈয়দ জাবিদ হোসেন নিয়োগের অনিয়ম হয়নি বলে জানান।

জানা গেছে, কলা, মানবিক ও সমাজবিজ্ঞান স্কুলে এ বছর ভর্তি পরীক্ষায় অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে। উপাচার্য কাদির ভূঁইয়া ঐ স্কুলের ডিন হওয়ায় তিনি নিজের লোক দিয়ে প্রশ্নপত্র ছাপানো, সাজানো ও বাইন্ডিং সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় কাজ করিয়েছেন। একাডেমী ভবনে বসে এসব করার নিয়ম থাকলেও বাড়িতে বসে করা হয়েছে। প্রশ্ন ফাঁসের মাধ্যমে খুলনার একটা কোচিং সেন্টারের ৬৫ জন শিক্ষার্থীকে এখানে ভর্তির

'উপ-উপাচার্যের সঙ্গে আমার আবার লড়াই থাকবে কেন? সে কি আমার সমকক্ষ'

ড. এম আব্দুল কাদির ভূঁইয়া

উপাচার্য, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

২০০০ : ক্যাম্পাসে শিক্ষক কর্মকর্তারা রাজনীতি করছে। ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন সময় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে...

ড. কাদির ভূঁইয়া : শিক্ষকদের মধ্যে কোনো দলাদলি নেই। তাদের সমিতি আছে। তাছাড়া শিক্ষকরা কি আমার অধীন? ব্যক্তিগতভাবে কোনো শিক্ষক রাজনীতি করলে সে বিষয়ে তো আমি কিছু বলতে পারি না। আইনগতভাবে আমার করার কিছু নেই।

২০০০ : সম্প্রতি ক্যাম্পাসে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিছুদিন আগে আপনি নিজেও লাঞ্ছিত এবং আপনার বাসভবন ভাংচুর করা হয়েছে বলে আমরা জেনেছি। বিগত দিনে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার দোষীদের শাস্তি না হওয়ায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে...

ড. কাদির ভূঁইয়া : আপনার সঙ্গে আমি একমত। তবে এবার কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আপনারা জানেন, সিন্ডিকেট বিধান মোতাবেক দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। এখানে কোনো শৈথিল্য করা হয়নি। আশা করছি এটা বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতের জন্য রেফারেন্স হিসেবে কাজ করবে।

২০০০ : কিন্তু এ বিষয়ে গঠিত প্রথম তদন্ত কমিটির আহ্বায়কে আপনার সপক্ষে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। একারণেই কি তিনি কিছুদিন আগে পদত্যাগ করেন?

ড. কাদির ভূঁইয়া : বিষয়টা তার পদত্যাগ পত্রে উল্লেখ আছে। তিনি ব্যক্তিগত কারণে চলে গেছে।

২০০০ : পুনর্গঠিত কমিটির দেয়া রিপোর্টে গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে...

ড. কাদির ভূঁইয়া : কোনো কারণ নেই।

২০০০ : রিপোর্ট দাখিল কালে তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক আব্দুর রহমান ইতিপূর্বে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য গোলাম রহমানকে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে অভিযুক্ত। তিনি আবার আপনাকে লাঞ্ছিত করার ঘটনার বিচার দাবি করেছেন। কাজেই তার কাছ থেকে নিরপেক্ষ রিপোর্ট কতটুকু আশা করা যায়?

ড. কাদির ভূঁইয়া : এ তথ্য সঠিক না। বিচার করেছে শিক্ষক সমিতি। উনি সমিতির সভাপতি মাত্র। মনে করেন আমি সিন্ডিকেটের সভাপতি। সিন্ডিকেট কোনো সিদ্ধান্ত নিলে তার সব দায়দায়িত্ব কি আমার? যাই হোক,

সুযোগ দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাসে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা এটাই প্রথম। উপ-উপাচার্য সৈয়দ জাবিদ হোসাইন সহশিক্ষকরা ভর্তিতে অনিয়ম করেছেন অভিযোগ এনে তা তদন্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষকরা এখন কোণঠাসা অবস্থায় আছে। নতুন একটা গোষ্ঠী রাজনৈতিক রঙ বদলিয়ে সরকারি দলের নামে দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু পরিচালনা করছেন। এসব কারণে ত্যক্তবিরক্ত হয়ে ড. মোঃ রহমতুল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে গেছেন। জীববিজ্ঞান বিভাগের এই প্রবীণ শিক্ষক দুই দশক আমেরিকায় শিক্ষকতা করেছেন। দেশে ছাত্রদের পড়াশোনার উদ্দেশ্যে তিনি এখানে যোগ দিলেও রাজনৈতিক আক্রোশে তা সফল হয়নি। যেসব শিক্ষক বা কর্মকর্তা কর্তৃপক্ষের অনিয়মে সায় দিচ্ছে না, তাদেরই আওয়ামী লীগার হিসেবে চিহ্নিত করে নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। জোট সরকারের বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তির মনোনীত লোক ঢোকানোর জন্য শুরু হয়ে এডহক নিয়োগ। ডিসিপ্লিন প্রধানদের কোনো মতামত না নিয়ে সরাসরি উপাচার্যের মাধ্যমে এসব নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে ।

উপাচার্য ড. আব্দুল কাদির ভূঁইয়া এ ব্যাপারে ২০০০কে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্টে এডহকে নিয়োগ দেয়ার ক্ষমতা তার আছে। কিন্তু ডিসিপ্লিন প্রধান ও ডিনরা জানান, শিক্ষক নিয়োগের উদ্দেশ্য যদি পড়ানো হয়, তবে ডিসিপ্লিন প্রধান ও ডিনদের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। শিক্ষক নিয়োগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিয়ম, দুর্নীতি, দলীয়করণ এবং অধস্তনদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারে ক্ষুব্ধ সাধারণ ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মকর্তারা। এসব বিষয়ে তদন্তের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে গঠিত তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গত ১০ জুন বিশ্ববিদ্যালয় সরেজমিনে এসে তদন্ত করে গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য ও তদন্ত কমিটি প্রধান প্রফেসর মনিরুল হক ২০০০কে জানান, তদন্ত প্রায় শেষ পর্যায়ে। কাদির ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগের কিছু সত্যতা পাওয়া গেছে। শিগগিরই রিপোর্ট দেয়া হবে। মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য মোফাক্কের আহম্মেদ জানান, উপাচার্য কাদির ভূঁইয়া ইউজিসি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করেছেন। এজন্য মঞ্জুরি কমিশন তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে। আমরা তার বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুককে অবহিত করে স্মারকলিপি দিয়েছি। মঞ্জুরি কমিশনের দু'জন সদস্য ২০০০কে জানান, উপাচার্য কাদির ভূঁইয়া তদন্ত কমিটির সদস্য পরিকল্পনা ও উন্নয়ন উপ-পরিচালক মোঃ শামসুর কবির খানকে সাসপেন্ড করার ভয় দেখান এবং 'তুই' সম্বোধন করে অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করেন। শামসুর কবির তদন্ত কাজে খুলনায় গেলে উপাচার্য তাকে 'গেটআউট' বলে তার কক্ষ থেকে বের করে দেন এবং পুলিশে ধরিয়ে দেয়ার হুমকি দেয়। খুলনা মেডিকেল কলেজের শিক্ষক, খুলনা উন্নয়ন কমিটি নেতৃবৃন্দ এবং ছাত্রদলের নেতারা উপাচার্যকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছেন। ইতিমধ্যে শিক্ষক সমিতি উপাচার্যকে এসব বিষয়ে সংযত হওয়ার জন্য সভা-সমাবেশ, ধর্মঘট করে সতর্ক করে দিয়েছেন।

অবকাঠামো নির্মাণে অনিয়ম : তদন্ত হচ্ছে, রিপোর্ট হচ্ছে না

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পে সরকার ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। এ প্রকল্পের মেয়াদকাল ধরা হয় জুলাই '৯৮ থেকে জুন ২০০২ পর্যন্ত। কিন্তু প্রশাসনের অদূরদর্শিতা, অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে মূলত এ মোটা অঙ্কের অর্থের সিংহভাগ অপচয় হয়েছে।

যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্র হলো কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি। এছাড়া শিক্ষা উপকরণ, একাডেমিক ভবনসহ সংশ্লিষ্ট জরুরি অবকাঠামো নির্মাণে অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা। কিন্তু শিক্ষার্থীদের অতি প্রয়োজনীয় এ বিষয়গুলোর দিকে গুরুত্ব না দিয়ে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ আগেই উপাচার্যের বাসভবন, প্রাশসনিক ভবনসহ কয়েকটি প্রকল্প নির্মাণে ব্যয় করা হয়। এ ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাত্রা এতোই বেশি যে, নির্মিতব্য স্থাপনাগুলো ব্যবহার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়নি। প্রায় পৌনে ১ কোটি টাকা ব্যয়ে দ্বিতলবিশিষ্ট উপাচার্যের বাসভবন কাম অফিস হিসেবে যে ভবনটি নির্মিত হয়েছে, তা একদিকে প্রশাসন ভবন সংযুক্ত বিধায় সেখানে উপাচার্যের আবাসিক ভবন হিসেবে কতটুকু কার্যকর তা প্রশ্নাধীন। দ্বিতীয়ত, এ ভবনের সিন্ডিকেট একাডেমী কাউন্সিলসহ জরুরি প্রয়োজনে উপাচার্যের দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা, সভা অনুষ্ঠান, অতিথিদের ১০-১২ জনের বসার মতো স্পেস বা কক্ষ নেই। একই সঙ্গে ভবনে আবাসিক অফিস চালানোর জন্য সাপোর্টিং স্টাফের অফিসসহ প্রয়োজনীয় নথি সংরক্ষণ বা আসবাবপত্র রাখার ব্যবস্থা নেই বললেই চলে।

অপরদিকে মহাসড়কের ২০ গজের মধ্যে ১৫০০ বর্গমিটার জায়গায় ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে

এটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এর কোনো ভিত্তি নেই।

২০০০ : উপাচার্য এবং উপ-উপাচার্যের মধ্যে প্রশাসনিক একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই চলছে দীর্ঘদিন ধরে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ঐক্যে ফাটল ধরছে...

ড. কাদির ভূঁইয়া : কর্তৃত্ব তো আমার আছে। উপ-উপাচার্যের সঙ্গে আমার আবার লড়াই থাকবে কেন? সে কি আমার সমকক্ষ? আর সে কি করছে কি না করছে আমার জানা নেই।

২০০০ : সমস্যাটা নিয়োগকে কেন্দ্র করে হচ্ছে। আপনি এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দিচ্ছেন। হয়তো এ ক্ষেত্রে উপ-উপচার্য মনে করছেন আপনি অনিয়ম করছেন।

ড. কাদির ভূঁইয়া : বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্টে এডহক নিয়োগের ক্ষমতা আমার আছে। এখানে তার কিছু করার নেই। আর অবৈধ পন্থা অবলম্বন করার প্রশ্নই ওঠে না। বাছাই বোর্ডের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা অনেক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেই এডহকে নিয়োগ দেওয়া হয়। উপাচার্য বোর্ডের মাধ্যমে ঢোকান। সেখানে উপাচার্য থাকেন না।

২০০০ : একটা ভিন্ন প্রশ্ন। বিভিন্ন সময় আপনি শিক্ষক কর্মকর্তাদের সঙ্গে অশোভন ব্যবহার করেন। শিক্ষক কর্মকর্তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের এটাও একটা কারণ। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?

ড. কাদির ভূঁইয়া : এটা সঠিক তথ্য নয়। (বিব্রতকর অবস্থায় ফাইল সই করতে করতে)।

২০০০ : উপাচার্য হিসেবে এখানে আসার পর আপনি বিগত প্রশাসনের দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন কিন্তু এ ব্যাপারে আপনি কতটুকু সফল হয়েছেন?

ড. কাদির ভূঁইয়া : যতটুকু পেয়েছি পরিষ্কার করেছি। বাকিটা পরিষ্কার করার জন্য দু'বছর আগে সরকার তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল। কিন্তু তারা তো এখনো রিপোর্ট দেয়নি।

২০০০ : কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা লংঘন করে আপনি নিজেও শিক্ষক কর্মকর্তা নিয়োগ...

ড. কাদির ভূঁইয়া : এটাও ঠিক না।

২০০০ : গত মার্চে ৩৫ জন শিক্ষক কর্মকর্তাকে সিন্ডিকেটের অনুমোদন ছাড়াই পদোন্নতি দেয়া হয়। এটা কি অনিয়ম নয়?

ড. কাদির ভূঁইয়া : যারা অভিযোগ করছে তারা নিয়ম জানে না। বাছাইয়ের পর উপাচার্য সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে পদোন্নতি দিতে হয়। সেটা করা হয়েছে।

২০০০ : খুবিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় কঠোর গোপনীয়তা বা ভর্তি প্রক্রিয়া সারাদেশে সুনাম রয়েছে। কিন্তু এবছর কলা, মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান স্কুলে সে গোপনীয়তা ফাঁস...

ড. কাদির ভূঁইয়া : মোটেও ঠিক না। কোনো অভিযোগ নেই।

২০০০ : একটা কোচিং সেন্টারের ৬৫ জন শিক্ষার্থী কলা, মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান স্কুলে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। আপনি ঐ স্কুলের ডিন। উপ-উপাচার্যসহ শিক্ষকরা এ বিষয়ে দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ এনে তদন্তের দাবি করেছিল।

ড. কাদির ভূঁইয়া : অভিযোগ করলেই তো হবে না, সেটার ভিত্তি থাকতে হবে। আপনি যেটা বলছেন, সেটা কি প্রমাণিত! কখনোই নয়। ইতিপূর্বে ঘটেনি, এখনো ঘটছে না। এটা আপনার কাছ থেকে প্রথম শুনলাম।

নতুন প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু তাতে ৩০ থেকে ৩৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বসার জায়গা হচ্ছে না। ভবনটির নকশায় ত্রুটি এবং নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে, আওয়ামী লীগের দলীয় এক ক্যাডারকে গোপন সমঝোতার ভিত্তিতে এ কাজ পাইয়ে দেয়া হয়। নির্মাণকাজ হয়েছে রাতে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বা কনসাল্টিং ফার্মের কেউ তদারিক করেননি। এই সুযোগে নিম্নমানের উপকরণ দিয়ে ভবন নির্মাণ করা হয়।

শহীদ মিনার নির্মাণকাজ এখনো সমাপ্ত না হলেও সেখানে ব্যয় দেখানো হয়েছে ২০ লাখ টাকা। অথচ এর জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ৫ লাখ টাকা। শহীদ মিনার পরিদর্শনের পর একজন প্রকৌশলী ২০০০কে জানান, এতে যে ব্যয় দেখানো হয়েছে, প্রকৃতভাবে তার এক-তৃতীয়াংশও ব্যয় হবার কথা নয়। এছাড়া ছাত্রী হলের সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ, আসবাবপত্র, বই ও জার্নাল ক্রয়ে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন দুর্নীতি, অনিয়ম তদন্তের জন্য ২০০২ সালের অক্টোবরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রফেসর কে এম মোহসীনকে আহ্বায়ক করে ৬ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে। ঐ বছর ২১ অক্টোবর তদন্ত শেষ করা হয় এবং ডিসেম্বরে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়ার কথা। কিন্তু তা এখনো আলোর মুখ দেখেনি। তদন্ত কমিটির আহ্বাক কে এম মোহসীন বলেন, সবগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় একসঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। আশা করছি শিগগিরই রিপোর্ট জমা দিতে পারবো।

উপাচার্য-উপউপাচার্য দ্বন্দ্ব :
শিক্ষার্থীদের বঞ্চনা

উপাচার্য হিসেবে কাদির ভূঁইয়া আসার পর ২০০২ সালের জানুয়ারিতে উপ-উপচার্য হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসেন সৈয়দ জাবিদ হোসাইন। রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকে একই ঘরানার হলেও এখানে আসার কিছু দিনের মধ্যেই উপাচার্যের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব বাধে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে। প্রশাসনের এক কর্মকর্তা ২০০০কে জানান, বাগেরহাটের রামপালের বাসিন্দা সৈয়দ জাবিদ হোসাইন এখন বিএনপি নেতা সিটি মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমানের আশীর্বাদ নিয়ে চলছেন। রাজনৈতিক ও আঞ্চলিকভাবে তার এলাকায় দেড় শতাধিক লোক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ দিয়েছেন। উপ-উপাচার্য হলেও তিনি খুলনায় একটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চালু করে সেখানে সময় দেন বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়ে উপ-উপাচার্য যেখানে তার মনোনীত লোক নিয়োগ দিতে চান, সেখানে উপাচার্য এডহক ভিত্তিতে দিচ্ছেন। মূলত এ নিয়ে শুরু হয় তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এ ক্ষেত্রে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ পদ এবং সরকারি প্রভাবশীল মন্ত্রী ও স্থানীয় বিএনপি নেতা হুইপ আশরাফ হোসেনের আশীর্বাদ থাকায় উপ-উপাচার্যকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। উপাচার্য কাদির ভূঁইয়া উপ-উপাচার্যকে সরিয়ে তার জায়গায় অধ্যাপক ড. খায়রুল আজমের নাম প্রস্তাব করে ডিও লেটার ইস্যু করলে অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসে। অন্যদিকে উপাচার্যকে সরিয়ে তার জায়গায় উপ-উপাচার্য সৈয়দ জাবিদ হোসাইনকে বসানোর জন্য ক্ষমতাসীন বিএনপির একটা গ্রুপ ইতিমধ্যে প্রস্তাব করেছে বলে জানা গেছে। তবে জাবিদ হোসাইন জানান, উপ-উপাচার্য হিসেবে তার মেয়াদ শেষ করতে চান। উপাচার্য হওয়ার ইচ্ছা তার নেই। উপাচার্য কাদির ভূঁইয়া ২০০০কে বলেছেন, 'কর্তৃত্ব আমার আছে। সে কি করছে, কি না করছে আমার তা জানা নেই।'

শিক্ষার্থীরা জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখন নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত। উন্নয়নে তাদের কোনো মনোযোগ নেই। দু'বছর আগে ক্যাম্পাস উন্নয়নে ৪৫ একর জমি অধিকরণ প্রক্রিয়া শুরু হলেও এখন তা বাতিল হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর খুলনা মেডিকেল কলেজ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলেও সেখানকার কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টায় অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। অথচ গত তিন বছরে খুবিতে কোনো বরাদ্দ আনা সম্ভব হয়নি। ছাত্রছাত্রীদের জন্য কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, গবেষণাগার, ল্যাব, টিএসসি, খেলার মাঠ, অডিটোরিয়াম নেই। মেডিকেল ভবনের অভাবে নতুন ক্রয়কৃত ৩ লাখ টাকার যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ছাত্রাবাস সংকটের কারণে মোট ছাত্রছাত্রীর ২৪ শতাংশ হলে থাকার সুযোগ পাচ্ছে। বাকিদের থাকতে হচ্ছে বাইরে। উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের দ্বন্দ্বের জের ধরে প্রশাসনিক ঐক্যে ফাটল ধরেছে। কার্যক্রম হয়ে পড়েছে স্থবির। গণসংযোগ বিভাগের উপ-পরিচালক মোঃ নজরুল ইসলাম ২০০০কে বলেন, 'সমস্যা তো হচ্ছেই। আমার বিভাগের কথা ধরুন। দু'মাস আগে এ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ড. আজিজুল হাকিম অন্য বিভাগে বদলি হলেও এখনো আমাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেননি।' বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এইচ এম আল মামুন ২০০০কে বলেন, 'এখানে 'আছে'র চেয়ে 'নেই'য়ের তালিকা বড়। নানা বঞ্চনার মধ্যেও রাজনীতি নেই, সন্ত্রাস নেই, সেশনজট নেই। এ কারণে কষ্ট করে হলেও আছি আমরা। কিন্তু এ অবস্থা কতদিন থাকবে বলা যাচ্ছে না।'

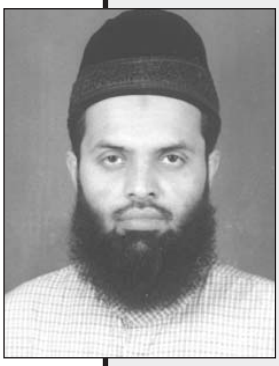

'যে রিপোর্ট করা হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক। আসলে খামখেয়ালিপনা করে ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য এটা করা হয়েছে'

ড. মোঃ সাইফুল ইসলাম

অর্থনীতি ডিসিপ্লিন প্রধান, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

সাপ্তাহিক ২০০০ : উপাচার্যকে লাঞ্ছিত ও তার বাসা ভাংচুর ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটি রিপোর্ট দিয়েছে। সিন্ডিকেট রিপোর্টের ভিত্তিতে যে চার জন শিক্ষককে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করেছে, তাদের মধ্যে আপনি একজন। আপনার ডিসিপ্লিনে ছাত্রদের উসকে দিয়ে ঐ ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে তদন্ত রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়েছে।

ড. মোঃ সাইফুল ইসলাম : তদন্ত কমিটি নিয়েই প্রশ্ন আছে। যিনি তদন্ত কমিটির আহবায়ক তিনি তদানীন্তন উপাচার্য ড. গোলাম আলী ফকির সাহেবকে লাঞ্ছিত করে তার কার্যালয়ে তালা দিয়ে রাখেন। তিনি আবার আরেকজন উপাচার্যকে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক হন কিভাবে? যে রিপোর্ট করা হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক। আসলে খামখেয়ালিপনা করে ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য এটা করা হয়েছে। ঐ ঘটনার সঙ্গে আমি জড়িত ছিলাম যাদের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে তারা কেউ বলতে পারবে না। অর্থনীতি ডিসিপ্লিনে কোন শিক্ষক জড়িত নেই।

২০০০ : আপনি বলছেন, প্রকৃত ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার উদ্দেশ্যে ঘটনা ঘটানো হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা কী?

ড. মোঃ সাইফুল ইসলাম : এটা দীর্ঘ দিনের ঘটনা। উপাচার্য কাদির ভূঁইয়ার দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, চারিত্রিক শৃঙ্খলা সারা বাংলার মানুষ জানে। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। অর্থনীতি ডিসিপ্লিনেও তিনি শিক্ষক নিয়োগে প্রমোশন ও ভর্তি পরীক্ষায় দুর্নীতি করেছেন। আমি এটা বাধা দেই। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এবিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি গত ১০ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। আমি তাদেরকে আমার ডিসিপ্লিনে উপাচার্যের দুর্নীতির তথ্য ফাঁস করে দেই। এরপর তিনি আমার প্রতি ক্ষুব্ধ হন এবং কয়েক দফা আমাকে শায়েস্তা করার প্রকাশ্য হুমকি দিয়েছেন। এই ঘটনা তারই প্রচেষ্টা মাত্র। উপাচার্য ষড়যন্ত্রমূলক এবং অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে আমাকে ঘায়েল করার জন্য তিনি নিজেই লাঞ্ছনার নাটক ঘটিয়েছেন।